যুগান্তর

তারিখ ... 16 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...7... কলাম ...2...

প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী

ঝরে পড়ছে ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থী

মুসতাক আহমদ

দারিদ্র্য, নোট-গাইড-কোচিংয়ের প্রাদুর্ভাব, বাল্যবিবাহ ও দুর্বল শিখন পদ্ধতি— এ চার প্রধান কারণে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমছে না। প্রথম শ্রেণীতে ১০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত টিকে থাকে মাত্র ৩২ জন। বাকি ৬৮ জনই ঝরে পড়ছে। সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। তবে ঝরে পড়ার প্রকৃত হার আরও বেশি বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। অথচ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ধরে রাখতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, উপবৃত্তি প্রদানসহ নানা ধরনের প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে।

দারিদ্র্যসহ চারটি প্রধান কারণ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের (ক্যাম্প) নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে ৬৮ জন হারিয়ে যাচ্ছে। এটা নিছক 'জাতীয় অপচয়'। মানুষ বিনিয়োগ করে সুফল ঘরে তোলার জন্য। কিন্তু আমরা তা পারছি না। দারিদ্র্যের সঙ্গে শিক্ষার অতি ব্যয় যুক্ত হওয়ায় ঝরে পড়ার ঘটনা বাড়ছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার বিষয়ে সম্প্রতি যুগান্তরকে বলেন, সাধারণত ছাত্রীদের বিয়ে, দারিদ্র্যের কারণে ছাত্রদের কর্মজীবনে প্রবেশ, একাদশ শ্রেণীর ফাইনাল ও এইচএসসির নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেলসহ নানা রূঢ় বাস্তবতার কারণে এ ঝরে পড়ার ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ঝরে পড়ছে ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছাত্রীদের ক্ষেত্রে। অনেকের বিয়ে হয়ে যায়। বাড়ির কাছে অনেকের কলেজ নেই। তাদের দূরে গিয়ে পড়ালেখা করা সম্ভব হয় না। এসব পরিস্থিতিতে ঝরে পড়ে। আর প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান একাধিকবার বলেছেন, প্রাথমিকে ঝরে পড়ার যে হার বলা হচ্ছে তা প্রকৃত নয়। উপবৃত্তির অর্থ ও বিস্কুট (স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাবার) নিয়ে গরমিল করতেই হিসাবে কারসাজি করা হচ্ছে। শিগগিরই এ কারসাজি বের করা হবে।

তবে দুই মন্ত্রীর সঙ্গে পুরোপুরি একমত নন রাশেদা কে চৌধুরী। তিনি যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষায় একদিকে অংশগ্রহণ বেড়েছে। অন্যদিকে ঝরে পড়ার হারও বাড়ছে। অংশগ্রহণ বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে বাবা-মা তার সন্তানকে লেখাপড়া শেখাতে চান। কিন্তু শিক্ষার ব্যয় দারুণভাবে বেড়েছে। সরকার শুধু বিনামূল্যে বই দেয়। কিন্তু খাতা, কাগজ, কলমের দাম প্রচুর বেড়েছে। কোচিংয়ের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। ক্লাসের পরিবর্তে বেশি টাকায় শিক্ষা কিনতে হয়। গাইড বইয়ের চাপও বেড়েছে। শিক্ষার্থীকে আগে এক সেট গাইড কিনলে চলত। এখন সৃজনশীল বুঝতে একাধিক সেট কিনতে হয়। পরীক্ষার ঠেলায় শিক্ষার্থীর এখন নাভিশ্বাস উঠেছে।

মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্রীদের নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে। আছে স্যানিটেশন সমস্যা। এ দুটির কারণে ছাত্রীরা ৮৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারে না বলে উপবৃত্তি পায় না। সবমিলিয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থী-অভিভাবকের শিক্ষার ব্যয়বহন অসাধ্য হয়ে উঠেছে। যে কারণে প্রাথমিকের পরবর্তী স্তরগুলোতে ঝরে পড়ার হার কাঙ্ক্ষিতভাবে কমছে না।

তার কথার সমর্থন মেলে বিশ্বব্যাংকের গবেষণায়ও। ২০১৪ সালের মার্চে ঢাকার বিশ্বব্যাংক মিশন বাংলাদেশের শিক্ষার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী ঝরে পড়ার মূল কারণ দারিদ্র্য। দুর্বল শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের দুর্বল ভিত্তিসহ আরও বেশ কয়েকটি কারণও চিহ্নিত করেছে এ সংস্থাটি।

যুগান্তরের অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী বা এইচএসসি পাস করা পর্যন্ত শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে ধাপে ধাপে। প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণী পৌঁছার আগে পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতেই ঝরে পড়ার রেকর্ড আছে। পঞ্চম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষায় নিবন্ধনকৃত এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। আবার ফলপ্রকাশের পর যাদের ফেল করা হিসেবে পাওয়া যায়, তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ঝরে যায়। এ একই পরিস্থিতি দেখা যায়, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। প্রতি ক্লাসেই কিছু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। একই প্রবণতা দেখা যায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে। একাদশ শ্রেণীতে যে সংখ্যক শিক্ষার্থী নিবন্ধন করে, তার সবাই এইচএসসি পরীক্ষায় বসে না। আবার এইচএসসি পাস করার পরও বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে শিক্ষার স্রোতধারা থেকে হারিয়ে যায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও পাবলিক পরীক্ষাগুলোর রেকর্ড ঘেঁটে দেখা যায়, সর্বশেষ গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত জেএসসি-জেডিসি (অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী) পরীক্ষায় ২২ লাখ ৭২ হাজার ২৮৯ জন অংশ নেয়। পাস করে ২০ লাখ ৯৮ হাজার ৮২ জন। এখানে ১ লাখ ৭৪ হাজার ২০৭ জন ফেল করেছে। এছাড়া আরও লক্ষাধিক শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেও পরীক্ষার ফরম পূরণ করেনি। এ পৌনে ৩ লাখ শিক্ষার্থী শুধু এক বছরেই ঝরে পড়েছে।

এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য ১৬ লাখ ৯৫ হাজার ৪৬৭ শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেছিল। তাদের মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৬ লাখ ৫১ হাজার ৫২৩ জন। পাস করে ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন। পাস করা এসব শিক্ষার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির আবেদনের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ১৩ লাখ ১ হাজার ৯৯ জন আবেদন করেছে। নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির আবেদন পর্যন্ত ২ বছরে ঝরে পড়েছে ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৩৬৮ জন। এখানে ঝরে পড়ার হার ২৬ ভাগের বেশি। আবার ২০১৪ সালে এসএসসি পাস করেছিল ১৩ লাখ ৩ হাজার ৩৩১ জন। পাসের পর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল ১২ লাখ ২ হাজার ৬১৭ জন। এদের মধ্যে ৯ লাখ ৬১ হাজার ৭০২ জন পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। সেই হিসাবে ঝরে পড়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার ৯১৫ জন। এদের মধ্যে ছাত্র ১ লাখ ১১ হাজার ৬৭২ জন, ছাত্রী ১ লাখ ২৯ হাজার ২৪৩ জন। অর্থাৎ ছাত্রী ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি। এসএসসি পাসের পর এইচএসসি পরীক্ষা দেয়া পর্যন্ত ২ বছরে ঝরেপড়ার হার ২৬ শতাংশের বেশি।

দীর্ঘদিন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে (ডিপিই) কর্মরত ছিলেন যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ ফসিউল্লাহ। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি কাছ থেকে তদারকি করেছেন তিনি। বর্তমানে এ কর্মকর্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যানবেইসে কর্মরত। তার নেতৃত্বে এবারের বাংলাদেশ শিক্ষা পরিস্থিতির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি হয়। মোহাম্মদ ফসিউল্লাহ মঙ্গলবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, ঝরে পড়ার সাধারণ কিছু কারণ আছে। এর মধ্যে দারিদ্র্য অন্যতম। এছাড়া মেয়েদের বিয়ে হওয়া আর ছেলেদের ভাগ্যান্বেষণে যাওয়া আরও দুটি বড় কারণ।

ব্যানবেইস ২০১৫ সালের শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এটি বর্তমানে ছাপাখানায় রয়েছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হার ৪০ দশমিক ২৯ শতাংশ। উচ্চমাধ্যমিকে ২২ দশমিক ৭০ শতাংশ। আর গত ডিসেম্বরে ডিপিই প্রকাশিত 'বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সমীক্ষা' (এপিএসসি) অনুযায়ী প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার বর্তমানে ২০ দশমিক ৪ শতাংশ। এ প্রতিবেদন বলছে, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির পর পঞ্চমে উঠা পর্যন্ত প্রতি ক্লাসেই শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। পাশাপাশি প্রতি ক্লাসে সাড়ে ৬ শতাংশ পুনঃভর্তি হয়।

ব্যানবেইসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে প্রাথমিকে ভর্তি শিশুর সংখ্যা প্রায় চার লাখ কমেছে। মাধ্যমিকে ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ঝরে পড়ার হার সামান্য কমেছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিকে বেড়েছে। মাধ্যমিকে ২০১৪ সালে ৪১ দশমিক ৫৯ শতাংশ ঝরে পড়ত। ২০১৫ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ২৯ শতাংশ। উচ্চমাধ্যমিকে ২০১৪ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ২১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ দশমিক ৭০ শতাংশ। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থী তিন কোটি ৬৬ লাখ ৪৬ হাজার ৫১৯ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা এক কোটি ৮৪ লাখ ৩৮ কোটি ৬৩৭ জন। যা মোট শিক্ষার্থীর ৫০ শতাংশ। এতে গড়ে ছাত্রছাত্রীর সমতা অর্জিত হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ রোববার যুগান্তরকে বলেন, বিভিন্ন পর্যায়ে আলাদা কারণে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। এর কোনোটির সঙ্গে কোনোটি মেলানো যাবে না। প্রাথমিকে দারিদ্র্যের কারণে অনেকে ঝরে পড়ে। জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পাসের পরও ভর্তি পর্যায় পর্যন্ত ঝরে পড়ার ঘটনা আছে। এর মধ্যে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহ, নিরাপত্তার অভাব এবং ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য অন্যতম কারণ।

তবে বাল্যবিবাহ, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, কুসংস্কার, লেখাপড়ার খরচ বিশেষ করে প্রাইভেট-কোচিং খরচ চালাতে না পারা, বাবার সঙ্গে ছেলের উপার্জনে নেমে পড়াসহ আরও বেশ কয়েকটি কারণ আছে বলে জানিয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন। তিনি বলেন, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এসব কারণ পাওয়া গেছে। এ কারণেই ছাত্রীদের পাশাপাশি এখন ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে।